আগস্ট ২০১০ ❖ ১০ টাকা

# অনীক

## ভূপাল গ্যাসকাণ্ড

পরমাণু বিদ্যুৎ ❑ নিউক্লিয়ার দায়বদ্ধতা আইন

বিতর্ক : ৯ আগস্ট লালগড় সভা

অশান্ত কাশ্মীর ❑ ক্যান্সার আক্রান্ত ফালুজা

বিশ্ববিদ্যালয়ে ফতোয়া ❑ আফগান যুদ্ধের কথা

অনীক

আগস্ট ২০১০
বর্ষ ৪৭ ❑ সংখ্যা ২

**সম্পাদকীয়** ❑ ১

**ঘটনাপ্রবাহ**

নব দত্তের গ্রেপ্তার ও আমাদের প্রতিবাদ ❑ ২
বধ্যভূমি কাশ্মীর ❑ সিদ্ধার্থ গুহ রায় ❑ ৩
উইকিলিকস— মার্কিন... ❑ প্রণব দে ❑ ৫
শিরিন মিদ্যা তালিবানি ফতোয়া ❑ দত্তাত্রেয় মিত্র ❑ ৭
ফালুজা : সভ্যতার বর্বরতা ❑ মিতা দত্ত ❑ ৮

**বিতর্ক : ৯ আগস্ট লালগড় সভা**

অমিতাভ ভট্টাচার্য ❑ পি গোবিন্দন কুট্টি
❑ প্রেমাংশু দাশগুপ্ত ❑ ৯

**প্রবন্ধ**

ভারতের নিউক্লিয়ার দায়বদ্ধতা আইন
❑ সমরেশ মিত্র ❑ ১৩
পরমাণু বিদ্যুতের রাজনীতি ❑ এস কুমার ❑ ১৮
ভূপালের গ্যাসপীড়িতরা... ❑ পুণ্যব্রত গুণ ❑ ২২
ভূপাল 'দুর্ঘটনা' ... ❑ শুভাশিস মুখোপাধ্যায় ❑ ২৬

*যোগাযোগ ও টাকা-পয়সা পাঠাবার ঠিকানা :*
প্রযত্নে/পিপলস বুক সোসাইটি
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯

*লেখা ও চিঠিপত্র পাঠাবার ঠিকানা :*
দীপংকর চক্রবর্তী (সম্পাদক, অনীক)
শ্যাম বিহার। ব্লক-৫। ফ্ল্যাট ১. ডি। রঘুনাথপুর।
কলকাতা - ৭০০ ০৫৯ ❑ *ফোন :* ২৫৭৯-৭৬৬৬

ই-মেল : aneek64@gmail.com
ইন্টারনেট ঠিকানা : www.aneek.org

*কার্যালয় :*
**১১, রাজা রামমোহন সরণী। কলকাতা - ৭০০ ০০৯**
(মঙ্গলবার : সন্ধ্যা সাতটা থেকে সাড়ে আটটা)

*সম্পাদক :* **দীপংকর চক্রবর্তী। রতন খাসনবিশ**

## 'পরিবর্তন'-এর কো-ল্যাটারাল ড্যামেজ !

*সম্প্রতি লালগড় আন্দোলনের সঙ্গে ভোটের রাজনীতির সংমিশ্রণে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে নাগরিক সমাজের এক সদা-বাঙময় অংশের যে আত্মসমর্পণের নাটক লালগড়ে প্রখর খটখটে রোদের মধ্যে প্রকাশ্যে মঞ্চস্থ হলো, কী নামে তাকে অভিহিত করা যায় : 'কো-ল্যাটারাল ড্যামেজ'? ঠিক যেমন অভিহিত করেছিল মার্কিন প্রশাসন আট বছর আগে ইরাকে তাদের নির্লজ্জ আগ্রাসনের দরুণ সংঘটিত প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতিকে?*

বস্তুত লালগড় আন্দোলনকে ঘিরে গত প্রায় দু'বছর ধরে এই রাজ্যের নাগরিক সমাজের যে ছবিটি প্রতিফলিত হয়েছে, তা এক কথায় বিচিত্র। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের গণ-বিস্ফোরণের প্রেক্ষিতে সেই লড়াইয়ের পক্ষে এই রাজ্যে দল-মত-নির্বিশেষে নাগরিক সমাজের যে গৌরবময় উত্থান ঘটেছিল, তার ধারাবাহিকতায় ২০০৮-এর শেষ দিকে লালগড়ে আদিবাসী জন-সাধারণের অভূতপূর্ব জাগরণের পক্ষেও, অন্তত প্রথম পর্বে, নাগরিক সমাজ বিপুল সংখ্যায় দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু এক দিকে সেই আন্দোলনের মৌলিক ও ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলি পূরণে সরকারি টালবাহানা, অন্যদিকে তজ্জনিত বিক্ষোভের পটভূমিকায় সেই আন্দোলনের উপর 'মাওবাদীদের' একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও মূল দাবিগুলিকে কার্যত সরিয়ে দিয়ে সেখানে প্রতিবাদ-যোগ্য হত্যাকাণ্ডের ক্রমপ্রসারের পরিণতিতে বহু মানুষ সংশয়-দীর্ণ হয়ে পড়তে বাধ্য হন। ফলত সেই আন্দোলনের পিছনে জনসমর্থনে ভাটা পড়তে শুরু করে। ইতিমধ্যে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম লড়াইয়ের ফসল আত্মসাৎ করে তৃণমূল কংগ্রেস এই রাজ্যে ক্ষমতাসীন সিপিআই(এম)-কে ভোটের লড়াইয়ে ক্রমশ পিছনে হটিয়ে দিতে থাকে। সেই পটভূমিকাতে 'মাওবাদীরা' একদিকে লালগড় আন্দোলনের পিছনে বিপুল জনসমর্থনের লক্ষণীয় অনুপস্থিতিকে নাগরিক সমাজের 'সুবিধেবাদ' হিসেবে চিহ্নিত করে এই তত্ত্ব হাজির করেন যে, লালগড় আন্দোলনের প্রতি সংসদীয় পথের যাত্রীদের (এক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেস) অনুৎসাহ এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের কারণেই নাগরিক সমাজের সমর্থন হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে একের পর এক সুস্পষ্ট দিক্‌নির্দেশহীন 'মঞ্চ' গড়ে ওই আন্দোলনের পক্ষে এবং অপারেশন গ্রিন হান্ট তথা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা চলতে থাকে। এই পটভূমিকাতেই সম্প্রতি সোচ্চার ধ্বনি ওঠে : লালগড় চলো। এজন্যও একটি আলাদা মঞ্চ প্রায় রাতারাতি তৈরি হয়ে যায়। কলকাতা-সহ বিভিন্ন জেলায় প্রস্তুতি শুরু হয় দল-মত-নির্বিশেষে আগামী ১৫ আগস্ট সরকারের বেআইনি আদেশ অমান্য করে দলে দলে লালগড় অভিযানের।

ইতিমধ্যে লালগড়ে শুরু হয়ে গেছে অন্য এক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। যৌথ বাহিনীর ধারাবাহিক আক্রমণের সামনে গত কয়েক মাস ধরে 'মাওবাদীরা' ক্রমশ পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছেন। এখন যে অবস্থা, সম্ভবত অল্প দিনের মধ্যেই সেখান থেকে তাঁদের রণকৌশলগত পশ্চাদপসরণ করতে হবে। আর সেই শূন্য স্থান পূর্ণ করার জন্য তৈরিই আছে সিপিআই(এম)-এর হার্মাদ বাহিনী। ইতিমধ্যেই তারা যৌথবাহিনীর প্রত্যক্ষ সহায়তায় 'মাওবাদীদের' একদা-নিয়ন্ত্রিত গ্রামগুলিতে নিজেদের দখল প্রায় কায়েম করে ফেলেছে। এই প্রক্রিয়া

প্রবন্ধ

# ভূপালের গ্যাসপীড়িতরা কেমন আছেন?

পুণ্যব্রত গুণ

সম্প্রতি আদালতে ফরসালা হয়ে গেল বিশ্বের বৃহত্তম শিল্প দুর্ঘটনা-ভূপাল গ্যাস কাণ্ডের। গ্যাসপীড়িতদের ক্ষুদ্র এক ভগ্নাংশ ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলেন। এবার ইউনিয়ন কার্বাইডের কয়েকজন অফিসারকে যৎসামান্য সাজা দেওয়া হলো। গ্যাসপীড়িতরা যাঁর শাস্তি চেয়েছিলেন— ইউনিয়ন কার্বাইডের তৎকালীন চেয়ারম্যান সেই ওয়ারেন অ্যান্ডারসন অধরা রয়ে গেলেন।

১৯৮৪-র ২-৩ ডিসেম্বর রাতে ইউনিয়ন কার্বাইডের ভূপালস্থ কীটনাশক তৈরির কারখানা থেকে বিষগ্যাস বেরোনোর পর থেকে গ্যাসপীড়িতেরা আন্দোলনে নামেন। তাঁরা জানতে চান— কী ছিল বিষগ্যাসের মিশ্রণে, মানব শরীরে সে সব বিষের কীই বা প্রভাব, কী এই বিষের প্রতিষেধক। তাঁরা দাবি জানান সুচিকিৎসার, ক্ষতিপূরণের। তাঁদের দাবি মেটেনি আজও।

ভূপালের গ্যাসপীড়িতদের লড়াই-এ বার বার সামিল হয়েছেন দেশ-বিদেশের মানুষ। আমাদের গর্বের বিষয়— সেই লড়াই-এর শুরুতে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেন পশ্চিম-বাংলার জুনিয়ার ডাক্তাররা। ইউনিয়ন কার্ডাইড প্রাঙ্গণে গ্যাস-পীড়িতদের স্থাপন করা জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসকের ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁরা। পরে বার বার তাঁরা ভূপালে ছুটে গেছেন সর্বেক্ষণ করার জন্য— গ্যাসপীড়িতরা কেমন আছেন।

## কী ঘটেছিল সেই দিন রাতে?

গ্যাসকাণ্ডের আগে ভূপাল কারখানার বিপজ্জনক ফস্‌জিন/মিথাইল আইসোসায়ানেট ইউনিটে মোট ৬১টি দুর্ঘটনা হয়। তার মধ্যে ৩০টা ছিল বড়ো ধরনের আর ১১টা ছোটোখাটো। তা সত্ত্বেও ইউনিয়ন কার্বাইড কর্তৃপক্ষ কারখানার সুরক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা করেনি।

- কীটনাশক প্রস্তুতিতে মিথাইল আইসোসায়ানেট (MIC) ব্যবহার করা হতো। অথচ ইউনিয়ন কার্বাইডই আরেকটা পদ্ধতির পেটেন্ট নিয়েছিল, যাতে MIC ছাড়াই কীটনাশক উৎপাদন করা যায়।
- ভূপাল কারখানায় লম্বা সময় ধরে বেশি পরিমাণে MIC জমিয়ে রাখা হতো। অথচ ইউনিয়ন কার্বাইডেরই ভার্জিনিয়াস্থ কারখানার তা রাখা হতো কম পরিমাণে ও কম সময়ের জন্য।
- ভূপালের MIC রাখা হতো বড়ো বড়ো ট্যাংকে, অথচ অন্য দেশগুলোর কারখানায় তা রাখা হতো ছোটো ছোটো পাত্রে।
- ভূপালে গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতিগুলো মানবীকৃত পদ্ধতিতে (manually) নজরদারি করা হতো। ভার্জিনিয়ার বারো দফা সতর্কীকরণের ব্যবস্থাযুক্ত কম্প্যুটারকৃত পদ্ধতিতে নজরদারি চলতো।
- রাসায়নিক মজুতের নজরদারি ছিল না ভূপালে। অন্যত্র সেই ব্যবস্থা ছিল।
- ভূপালে MIC মজুত রাখা হতো O° সেন্টিগ্রেডে। ভার্জিনিয়া কারখানায় তা রাখা হতো ১০° সেন্টিগ্রেডে।
- ভূপাল কারখানায় রেফ্রিজারেশন ব্যবস্থা বন্ধ হওয়া সম্ভবপর ছিল, ভার্জিনিয়ায় জরুরি প্রয়োজনের জন্য অতিরিক্ত রেফ্রিজারেশন ব্যবস্থা ছিল।
- জলের ফোয়ারা মাত্র ৩৫ মিটার উঁচু অবধি যেতে পারতো ভূপালে, ভার্জিনিয়ায় জলের ফোয়ারা ছিল অনেক বেশি শক্তিশালী।
- ইউনিয়ন কার্বাইডের ম্যানুয়ালে স্টেনলেস স্টিলের পাইপ ব্যবহারের কথা আর ভূপাল কারখানায় ব্যবহার করা হতো কার্বন স্টিলের পাইপ।
- ভূপালের কারখানা ছিল ঘন জনবসতির মধ্যে, অথচ ভূপাল উন্নয়ন পরিকল্পনার কারখানা শহরের বাইরে এমনভাবে রাখার কথা যাতে কারখানার দিককার হাওয়া শহরের দিকে না যায়।
- ভূপাল কারখানায় সতর্কীকরণ ব্যবস্থায় কেবল শ্রমিকরাই সতর্ক হতে পারেন, অথচ সতর্কীকরণ ব্যবস্থা ও লাউড স্পিকার এমনভাবে থাকার কথা, যাতে লাগোয়া জনবসতির মানুষ সতর্ক হতে পারেন।

এছাড়াও সুরক্ষা ব্যবস্থায় আরও কিছু ঘাটতি ছিল— দুর্বোধ্যতা এড়ানোর জন্য যার উল্লেখ করছি না।

কাজ চালানো হতো প্রশিক্ষণহীন কর্মীদের দিয়ে। একই কর্মীরা MIC ট্যাংক থেকে ভেন্ট গ্যাস স্ক্রাবারে যাওয়ার পাইপ জল দিয়ে ধুতে যান। খারাপ পাইপ, খারাপ ভাল্‌ভের কারণে জল ঢোকে MIC-র ট্যাংকে— তারপর রাসানয়িক বিক্রিয়ায় বিষগ্যাস নিঃসরণ।

ইউনিয়ন কার্বাইড ঘটনার দায়ভার চাপাতে চেয়েছিল শ্রমিকদের অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্মের ওপর, কখনও বা কল্পিত শিখ সন্ত্রাসবাদীর ওপর। আসল ঘটনা হলো কম খরচের বিপজ্জনক প্রযুক্তি দিয়ে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে বিপজ্জনক রাসায়নিক উৎপাদনই ভূপাল গ্যাসকাণ্ডের কারণ।

## কী ছিল বিষগ্যাসে?

তা এখনও আমরা সঠিক জানি না। তবে দূষিত সামগ্রীর বিশ্লেষণ, নিহতদের ময়নাতদন্ত ইত্যাদি থেকে ধারণা করা

যায়— ২-৩ ডিসেম্বরের বিষ গ্যাসে ছিল MIC, ফসজিন, হাইড্রোজেন সায়ানাইড, কার্বারিল, মিথাইল অ্যাথাইন, মোনো মিথাইল অ্যামাইন, কার্বন মনো অক্সাইড, কার্বন ডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড, নাইট্রিল, ক্লোরোফর্ম, হাইড্রোজেন ক্লোরাইড।

**গ্যাস কীভাবে ছড়িয়ে পড়ল?**

সেদিনকার আবহাওয়া ছিল খুব প্রতিকূল। উত্তর দিক থেকে হাল্কা হাওয়া বইছিল কারখানার লাগোয়া জনবসতির দিকে। তাপমাত্রা ছিল ৭-১০° সেন্টিগ্রেড, হাওয়ার আর্দ্রতা ছিল কম। আক্রান্ত এলাকা মোটামুটি সমতল, একটু ঢাল রেলওয়ে স্টেশন ও ভূপালের পুরোনো শহরের দিকে।

বিষ গ্যাসের মেঘ ভূপালের পুরোনো শহরকে ধীরে ধীরে ঢেকে ফেলে, তারপর তা ছড়িয়ে যায় নতুন শহর এবং দুটো হ্রদের ওপর।

**গ্যাসের আশু প্রবাহ**

২রা ডিসেম্বর ১৯৮৪ রবিবার মুসলমানদের এক বড়ো ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে হাজার হাজার তীর্থযাত্রী ভূপালে এসেছিল। তার সঙ্গে ছিল বিয়ের মরসুম, আত্মীয়স্বজনরা এসেছিলেন ভারতের নানান প্রান্ত থেকে। কুয়াশায় ট্রেন পৌঁছোতে দেরি হওয়ার জন্য ১০১ জন কুলি-সহ সমস্ত রেলকর্মীরাই স্টেশনে ছিলেন।

যে সব ভূপালবাসী অনুষ্ঠানে যেতে ছিলেন না, তাঁরা ঘুমোচ্ছিলেন রাস্তায়, স্টেশনে, কাঁচা বা পাকা বাড়ীতে।

ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানার একদম কাছে যাঁরা থাকতেন, তাঁদের অনেকে মারা যান ঘুমের মধ্যে। অনেকে কাশি ও শ্বাসকষ্টে জেগে ওঠেন। তাঁদের মনে হতে থাকে যেন তাঁরা লংকার মত ঝাল কিছু গিলে ফেলেছেন, চোখ জ্বলতে থাকে, শ্বাসকষ্ট হতে থাকে, বমি করতে থাকেন তাঁরা। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখেন সাদা ধোঁয়াশার এক চাদর। কয়েকজন বিছানার কম্বল মুড়ি দিয়ে থেকে যান। বেশিরভাগ কারখানার দিক থেকে পালিয়ে যেতে থাকেন মেঘের গতির সঙ্গে। ফলে বেশি গ্যাস তাঁদের শরীরে ঢোকে। পক্ষান্তরে যাঁরা থেকে যান, তাঁদের শরীরে ঢোকে কম গ্যাস। যাঁরা অবশ্য বিষমেঘের গতির বিপরীতে পালিয়ে ছিলেন তাঁদের ক্ষতি হয় কম।

দুজন কর্মী স্টেশনে রাতের শিফ্‌টে ছিলেন, তাঁরা নিকটবর্তী স্টেশনগুলোতে বার্তা পাঠাচ্ছিলেন যাতে ট্রেন ভূপালে না আসে। সে ২ জন মারা যান।

পরদিন ভোরে কারখানার চারদিকে প্রত্যেকটা গরু, মোষ, ছাগল, কুকুর, বিড়ালকে মরে পড়ে থাকতে দেখা যায়। কেবল পাখি আর ইঁদুর রক্ষা পেয়েছিল। কয়েকদিনের মধ্যে গাছের পাতা খসে পড়ে, ঘাস হলুদ হয়ে যায়।

**কতজন প্রভাবিত?**

ভূপালের ৩৬টা ওয়ার্ডকে 'গ্যাস-প্রভাবিত' বলে ঘোষণা করা হয়। ১৯৮৪তে এই ৩৬টা ওয়ার্ডে থাকতেন ৫২০,০০০ মানুষ, যাঁদের মধ্যে ২০০,০০০ জন ১৫ বছরের কম বয়সী এবং ৩০০০ গর্ভবতী মহিলা। গ্যাসকাণ্ডে মৃত্যুর সংখ্যা হিসাবে ওয়ার্ডগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা হত— ভীষণ প্রভাবিত (২টা ওয়ার্ড, জনসংখ্যা ৩২,০০০) মাঝারি প্রভাবিত (৫টা ওয়ার্ড, জনসংখ্যা ৭২,০০০), অল্প প্রভাবিত (২৯টা ওয়ার্ড, জনসংখ্যা ৪১৫,০০০)।

ভারতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান সংস্থান (ICMR)-এর হিসাবে মোট প্রভাবিত ২১,২৬২। তাঁদের মধ্যে কিছু তীর্থযাত্রী, বিয়েবাড়ির অতিথি, ঠিকানাহীন মানুষ বা ভবঘুরেদের ধরা হয়নি। এই হিসাবে ধরা হয়নি যাদের গর্ভে থাকা শিশুদের বা গ্যাস আক্রান্ত বাবা-মার সন্তানদের, যারা পরোক্ষভাবে গ্যাস আক্রান্ত।

তবে এই সব সংখ্যা কতোটা নিখুঁত বলা মুশকিল। ১৯৮৯-এ যখন অন্তর্বর্তীকালীন ত্রাণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয় তখন ভূপালের ৫৬ ওয়ার্ডকেই গ্যাস-আক্রান্ত বলে বিবেচনা করা হতো।

ক্ষতিপূরণের হিসাবে বলা যায় ১৪,০০০-এর বেশী মৃত্যু এবং ৭৩০,০০০-এর বেশি ব্যক্তিগত ক্ষতির ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে এখনও অবধি।

**স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব**

গ্যাস-আক্রান্তরা প্রাথমিকভাবে তীব্র শ্বাসকষ্ঠ, শ্বাসনালী ও চোখ জ্বালায় ভুগছিলেন। সাথে ছিল পেটে ব্যথা ও বমি। চামড়া লাল হয়ে গেছিল। চোখের পাতায় জল জমেছিল, কর্নিয়ার ঘা হয়েছিল। অনেক রোগীর ফুসফুসে জলজমে, শ্বাসনালীতে আক্ষেপ হতে থাকে। মারা যান এভাবে অনেকে। অনেকের ফুসফুসের আবরণীতে হাওয়া জমে, চামড়ার নীচে এবং দুটো ফুসফুসের মাঝে হাওয়া জমে। শ্বাসনালী ও ফুসফুসের আবরণীর মধ্যে নালী ঘা তৈরি হয়, জীবাণু সংক্রমণ হয়।

গ্যাসকাণ্ডের ২ সপ্তাহের মধ্যে ভূপালে জন্ডিসের মহামারী দেখা যায়। সাধারণত জন্ডিস হয় ভাইরাস সংক্রমন থেকে, এক্ষেত্রে কারণ হলো বিষ রাসায়নিক। অনেকের খাদ্যনালীতে রক্তক্ষরণ হয়, কিডনিতে ব্যথা দেখা যায়। তৃতীয় দিনের পর থেকে যাঁরা মারা যান, তাঁদের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের বিকলতা দেখা যায়।

গ্যাসকাণ্ডের পর মৃত সন্তান প্রসবের হার ৩০০% বেড়ে যায়, নবজাতকের মৃত্যুর হার বাড়ে ২০০%। CMR-এর গবেষণার দেখা যায়, স্বতঃস্ফূর্ত গর্ভপাতের হার ২৪.২%, যা জাতীয় গড়ের প্রায় ৩ গুণ।

**চিকিৎসা**

বিষ গ্যাসের চরিত্র জানা না থাকার চিকিৎসকরা পথ হাতড়াতে থাকেন।

৫ই ডিসেম্বর ইউনিয়ন কার্বাইডের সদর দপ্তর থেকে অসা এক টেলিগ্রাফে বলা হয় : "সায়ানাইড বিষক্রিয়া সন্দেহ করলে অ্যামাইল নাইট্রাইট ব্যবহার করুন। তাতে ফল না হলে সোডিয়াম নাইট্রাইট ও সোডিয়াম থারোসালফেট"। পরে ইউনিয়ন কার্বাইড বলে— এই টেলিগ্রাফ নাকি ভুল করে পাঠানো হয়েছিল।

তীব্র অবস্থার চোখ জল দিয়ে ধোয়া হতে থাকে, চোকে হোমাট্রপিন, জীবাণুনাশক ও স্টেরয়েড দেওয়া হয়। শ্বাসকষ্টের চিকিৎসা করা হয় অক্সিজেন, শ্বাসনালী প্রসারক, ..... ও স্টেরয়েড দিয়ে। অক্সিজেনে তেমন লাভ হয় না, ২-৩ দিনে অবস্থা খারাপ হয়, স্টেরয়েডে ফুসফুসে জমা জল কমে, ২-৩ দিন স্টেররেড বন্ধ করলে আবার জল জমে। পেটের কষ্টের জন্য অ্যান্টাসিড দেওয়া হতে থাকে।

**বিষের প্রতিষেধক**

৩রা ডিসেম্বরই ভূপালের মেডিকোলিগ্যাল ইনস্টিটিউটের প্রধান মৃতদেহের ময়না তদন্তে সায়ানাইড বিষের খোজ পান। তিনি সমস্ত গুরুতর অসুস্থ রোগীদের সায়ানইডের প্রতিষেধক সোডিয়াম থায়োসালফেট (NaTS) দেওয়ার সুপারিশ করেন। হাসপাতালের সুপারিন্টেডেন্ট প্রত্যেক রোগীকে প্রতিষেধক দেওয়ার আগে রসোয়ানিক পরীক্ষা করে সায়ানাইড বিষক্রিয়া প্রমাণের দাবী জানান, ফলে NaTS চিকিৎসা দেওয়া হয় না।

আগেই বলেছি ইউনিয়ন কার্বাইডের এক টেলিগ্রাফে সায়ারানাইড বিষক্রিয়া সন্দেহে NaTS দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছিল।

পশ্চিম জার্মানি থেকে এক বিষবিদ্ আসেন NaTS-এর ৫০,০০০টি ডোজ নিয়ে। তিনিও মৃতদের রক্তপরীক্ষায় সায়ানাইডের উপস্থিতি পান। ৫০ জন রোগীকে NaTS ইঞ্জেকশন দিতে ভালো ফল পাওয়া যায়। দু'জন অচেতন রোগীকে তিনি NaTS দেন, একজন অত্যাশ্চর্য ভাবে সেরে ওঠেন, অন্য জন মারা যান। বিষবিদ একজন রোগীকে NaTS দিয়ে মেরে ফেলেছে— এই গুজব ছড়িয়ে তাঁকে ভূপাল ছাড়তে বাধ্য করা হয়।

১৩ই ডিসেম্বর মধ্যপ্রদেশের স্বাস্থ্য অধিকর্তা ভূপালের ডাক্তারদের নির্দেশ দেন— ল্যাবরেটরি পরীক্ষার সারানাইড বিষক্রিয়ার প্রমাণ না পাওয়া গেলে NaTS দেওয়া যাবে না। এখনটাই নাকি ICMR-এর নির্দেশ।

আসলে কিন্তু ICMR রোগীদের মধ্যে একটি ডাবল-ব্লাইন্ড সমীক্ষা চালায় ১৯৮৪-এর ডিসেম্বরে; রোগীদের উপসর্গে প্রভূত উননতি দেখা যায়। ICMR বরং নির্দেশ দেয় কীভাবে NaTS দিতে হবে সে সম্পর্কে।

ভূপালের সরকারি ডাক্তাররা এর পরেও NaTS-এর বিরোধিতা করতে থাকেন। আসলে এঁদের অধিকাংশই ছিলেন ইউনিয়ন কার্বাইডের সুবিধাভোগী। বিষগ্যাসে সায়ানাইডের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হলে ইউনিয়ন কার্বাইডের দায়ভার বাড়বে, তাই তাদের এমত আবরণ।

১৯৮৫-র জুন থেকে ১৯৮৭-র মাঝামাঝি গ্যাসপীড়িতদের গড়ে তোলা জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রে গ্যাসপীড়িতদের NaTS-এর ইঞ্জেকশন লাগিয়ে ফলাফল নথিভুক্ত করা হয়ে চলেছে। তাতেও রোগীদের উপসর্গে উন্নতি পাওয়া যায়।

তবু গ্যাস-পীড়িতদের NaTS চিকিৎসা হয় না, যেমনটা হলে বোধ হয় ভালো হতো।

**গ্যাসের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব**

গ্যাসকাণ্ডের তদন্ত করেছিল যে কমিশন, তার সভাপতি ১৯৮৬ সালে জানান, ৩০ থেকে ৪০ হাজার জন মানুষ স্থায়ী ভাবে প্রতিবন্ধী হয়েছেন। প্রতিবন্ধীদের তিনি তিনভাগে ভাগ করেন :

১। এতটাই প্রতিবন্ধী যে কোন কাজ করতে পারেন না। স্নায়বিক সমন্বয়ের অভাবে হাঁটতে বা সাইকেলে চালাতেও পারেন না।

২। যাঁরা দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুসের অক্ষমতায় ভুগছেন, তবে এঁরা কিছুটা কাজ করতে পারেন।

৩। এঁরা আপাতদৃষ্টিতে ভালো, তবে এদের মধ্যে বিশেষত ফুসফুস ও শ্বাসনালীতে জীবাণু সংক্রমণের প্রবণতা বেশি।

গ্যাসপীড়িতরা কেমন আছেন তা নিয়ে ৫ বছর পর ১৯৮৯-এ সর্বেক্ষণ করে মেডিকো ফেন্ডস্ সার্কেল (MFC)-র সংগঠিত এক চিকিৎসক ও স্বেচ্ছাসেবী দল। ইন্টারন্যাশনাল মেডিকাল কমিশন অন্ ভোপাল (IMCB) গ্যাসপীড়িতদের তথ্যসংগ্রহ করেন ১০-৩৫ বছর পর। ICMR গ্যাসপীড়িতদের নিয়ে অনেক তথ্যানুসন্ধান করে, যার বেশির ভাগ রিপোর্ট আজ আলোর মুখ দেখেনি।

গ্যাসপীড়িতদের আন্দোলনের পুরোভাগে প্রথম দিকে ছিল যে সংগঠন সেই 'জহরিলী গ্যাস কাণ্ড সংঘর্ষ মোর্চা'র অন্যতম সংগঠকের উদ্যোগে গড়ে ওঠে 'সম্ভাবনা' চিকিৎসা কেন্দ্র, সেখানেও তথ্য সংরক্ষণ হয়ে চলেছে। এ ছাড়াও তথ্য সংগ্রহ করেছে অন্য অনেক সংগঠন। দেখা গেছে—

১। গ্যাসপীড়িতদের চোখে দীর্ঘস্থায়ী কনজাংটিভাইটিস, কর্নিয়ার ক্ষত চিহ্ন, চোখের জল শুকিয়ে গেছে, কর্নিয়ার অস্বচ্ছতা এবং কম বয়সে ছানি পড়ছে।

২। ফুসফুসের কার্যক্ষমতা কম। শ্বাসপথে অবরোধ। পুরোনো যক্ষ্মা বা দীর্ঘস্থায়ী ব্রংকাইটিস নতুন করে চাগাড় দিয়েছে, ফুসফুস তন্তুময় হয়ে গেছে (Pulmonary Fibrosis)।

৩। স্মৃতি শক্তি কমে গেছে, প্রতিক্রিয়ার গতি ও নজরদারির ক্ষমতা কম, মাংসপেশীর দক্ষতা কমেছে। ঝিন্‌ঝিনি, অসাড়ভাব, মাংসপেশীর ব্যথা, মাথা ব্যথা, ক্লান্তি, মনঃসংযোগে অভাব, বিরক্তি ভাব প্রবল।

৪। গ্যাসপীড়িত পরিবারগুলোকে জন্মগত বিকলাঙ্গতার হার বেশি। ক্যান্‌সারের হারও স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি।

৫। মানসিক সমস্যার মধ্যে দেখা গেছে আঘাত-পরবর্তী মানসিক চাপ (Post Traumatic Stress Disorder), দুঃখ প্রতিক্রিয়া (Pathological Grief Reaction), শারীরিক সমস্যার প্রতি আবেগজনিত প্রতিক্রিয়া, আগেকার মানসিক সমস্যা বেড়ে যাওয়া।

৬। মহিলাদের সাদাস্রাব, শ্রোণীর (তলপেটের) জীবাণু সংক্রমণ, জরায়ুগ্রীবার ঘা বা সংক্রমণ, অতিরিক্ত রক্তস্রাব, দুধ বন্ধ হয়ে যাওয়া।

৭। সম্ভবত গ্যাসপীড়িতদের মধ্যে ডায়াবেটিসের প্রাদুর্ভাবও বেশী।

**চিকিৎসার ব্যবস্থা : কেমন ছিল, এখন কেমন?**

গ্যাসকাণ্ডের পর ভূপালের চিকিৎসা ব্যবস্থা অপ্রতুল প্রতিপন্ন হয়। সরকার ও বেসরকারি উদ্যোগে হাসপাতাল গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়। ১৯৮৬-র শেষে সরকারি ১২টা স্বাস্থ্য কেন্দ্র, রেডক্রসের ৬টা স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও রয়াল কমনওয়েল্‌থ সোসাইটির একটা চোখের হাসপাতাল কাজ শুরু করে।

আগে থেকে যে হাসপাতালগুলো ছিল, সেগুলোতে শয্যা সংখ্যা বাড়ানো হতে থাকে। ২০০৩-এ সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মোট ৬৫ জন বিশেষজ্ঞ, ১৫৩ জন সাধারণ চিকিৎসক, ৪৩৯ জন প্যারামেডিকাল কর্মী ছিলেন। তবুও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল ছিল। অনেক হাসপাতালে যন্ত্রপাতি কর্মীর অভাবে পড়ে থাকতে দেখা যায়।

ইউনিয়ন কার্বাইডের দেওয়া ক্ষতিপূরণের টাকার এক অংশে তৈরি হয় ভূপাল মেমোরিয়াল ট্রাস্ট হাসপাতাল।

গ্যাসকাণ্ডের পর থেকে প্রাইভেট প্র্যাকটিশনারদের সংখ্যা বিপুলভাবে বেড়ে গেছে ভূপালে। তবে এঁদের প্রায় ৭০%ই পাস না করা ডাক্তার। সরকারি হাসপাতালের ডাক্তাররাও প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

ড্রাগ অ্যাকশন ফোরাম, পশ্চিমবঙ্গের জুনিয়র ডাক্তার ও MFC-র সদস্যদের সহায়তার জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র চলেছিল ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৭ অবধি।

ভূপাল রেলস্টেশনে মাদার টেরেসার মিশনারীজ অফ চ্যারিটি এক চিকিৎসা শিবির চালায় ইউনিয়ন কার্বাইডের পক্ষে।

১৯৮৫-তে ইউনিয়ন কার্বাইড ভারতের রেডক্রস সোসাইটিকে ৫০ লক্ষ টাকা দেয় চিকিৎসা কেন্দ্র চালানোর জন্য। ৪টা স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হয়। ৪ বছর পরে ইউনিয়ন কার্বাইড বাকী টাকা ফেরত নিয়ে নেয়, স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলো একে একে বন্ধ হয়ে যায়, শেষটা বন্ধ হয় ১৯৯৫-এ।

১৯৯৬-এ আরম্ভ হত সম্ভাবনা ট্রাস্টের ক্লিনিকের কাজ। অনেক মানুষের (যাঁদের অনেকে বিদেশি) দানে ও ডমিনিক দ্য ল্যাপিয়ারের ভূপাল সম্পর্কিত বই-এর রয়্যালটির টাকায় এই কেন্দ্র। অ্যালোপ্যাথি, আয়ুর্বেদ ও যোগের সমন্বয়ে গ্যাসপীড়িতদের রোগ চিকিৎসা প্রয়াস চালাচ্ছেন এঁরা।

ভূপাল গ্যাসকাণ্ডের পর ২৫ বছর কেটে গেছে। গ্যাস-পীড়িতদের দুর্ভোগের শেষ হয়নি আজও। জানা নেই আরও কতোদিন, কতো প্রজন্ম, তাঁরা ভুগে চলবেন। তবে আজও তাঁদের চিকিৎসার ব্যবস্থা অপ্রতুল। জানা নেই, কখনও তা পর্যাপ্ত হবে কিনা!

---

## ভারতের নিউক্লিয়ার দায়বদ্ধতা আইন

১৭ পৃষ্ঠার পর

বর্তমান ধারার কতগুলি সংশোধন সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব করেন যা সরকার এবং বিরোধীপক্ষ উভয়েই মেনে নেন। আশ্চর্য বিষয় এই যে, এই সমস্ত সংশোধনী সহ নতুন বিলটি যখন সাংসদদের দেওয়া হলো তখন দেখা গেল সরকার, বিরোধীদের মতে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং, আরও কিছু পংক্তি এবং শব্দ জুড়ে দিয়েছেন। এমন মারাত্মক কয়েকটি দিক আমরা এখানে সংক্ষেপে বলছি।

বিরোধী পক্ষের অজান্তে সরকার ৭নং ধারাতে কয়েকটি উপধারা জুড়ে দিয়েছেন, যা কিনা বিরোধী পক্ষের সর্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত সংশোধনীগুলোকে কার্যত নাকচ করেছে।

নাটক সবচেয়ে বেশি জমে উঠেছে ১৭(ক) ধারাটি নিয়ে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের অধীনে যে কমিটির কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, সেই কমিটির সভায় সিপিআই(এম)-একাধিক সংসদ ১৭(ক)-র ধারা নিয়ে সরল হন। এই উপধারায় একটি "এবং" শব্দ জুড়ে সরকার পক্ষ বিদেশি সরবরাহকারীকে তার দায়িত্ব থেকে সুকৌশলে মুক্তি দিয়েছিলেন। এই বিষয়টি জানাজানি হওয়ায় বিজেপিও এই বিষয়ে সরব হয়। সরকার বিরোধীদের দাবি মেনে নিয়ে এই উপধারায় "এবং" শব্দটি বাদ দিতে রাজি হয়ে যায়। কিন্তু সরকার সুকৌশলে ১৭(খ) ধারাটি নতুন করে এমনভাবে মুসাবিদা করে যার ফলে ১৭(ক) উপধারাটির সংশোধনটিকে ১৭(খ) ধারাটি সম্পূর্ণ নাকচ করে দিচ্ছে! দুঃখের কথা হলো এই ১৭(খ) ধারাটির নতুন বয়ান মুসাবিদা করেছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এবং তা সংসদের কোনও কমিটিতেই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়নি। সুকুমার রায় রহস্য করে বলেছিলেন "আরও কত ছিলো পাতে আলুভাজা-ঘুংনি..."। নাটক প্রায় পঞ্চমাঙ্কে— দেখা যাক তা কী পরিণতি পায়!